বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ৪৯-৬৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

কালোটাকা ও অর্থপাচার: বাংলাদেশে দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি

আবুল বারকাত*

১. বড়ই স্পর্শকাতর এবং স্বল্পগবেষিত বিষয় নিয়ে আমার প্রবন্ধ। বিষয় শিরোনামেই স্ব-ব্যাখ্যায়িত।

২. 'কালোটাকা' (Black Money) ও 'অর্থ পাচার' (Money Laundering) উভয়েরই মূলে আছে 'দুর্নীতি' (Corruption)। কালোটাকার অর্থনীতি (Economics of Black Money) ও অর্থপাচারের অর্থনীতি (Economics of Money Laundering) উভয়ই 'দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি'র (Politcal Economy of Corruption) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যদি তাই-ই হয়, তাহলে দুর্নীতির (Corruption) একটা কার্যকর সংজ্ঞা অথবা ধারণাকাঠামো বিনির্মাণ জরুরি (যদিও কাজটি জটিল)।

বড় পর্দায় দুর্নীতি বলতে আমরা সবাই বুঝি নীতিগর্হিত কিছু একটা অথবা বুঝি সেই প্রক্রিয়া অথবা কাজ (act অর্থে) যা বিশ্বাস বা আস্থা-লঙ্ঘন করে (violation of trust)। আর এই আস্থা-বিশ্বাস লঙ্ঘনের পেছনে নিঃসন্দেহে কোনো না কোনো 'অনুপ্রেরক' (trigger/incentive) কাজ করে।

৩. দুর্নীতি নতুন কোনো বিষয় নয়। দুর্নীতি যদি হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের অন্তঃজাত-অন্তর্নিহিত (inherent অর্থে) প্রাকৃতিক বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে দুর্নীতির উৎস-কারণ অনুসন্ধান অমূলক হবে। সেক্ষেত্রে মেনে নিতে হবে অ্যাডাম স্মিথের (১৭২৩-১৭৯০) 'প্রাকৃতিক স্বাধীনতাভিত্তিক ব্যবস্থা' (system of natural liberty) বিশ্বাসতত্ত্বে। যে বিশ্বাসতত্ত্ব বলে যে (১) 'প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ দিলে তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই সর্বোত্তম পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি করবে', 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থাতেও সামাজিক শৃঙ্খলা-সংহতি গড়ে উঠবে', (২) 'এক অদৃশ্য হাত বাজারব্যবস্থার মধ্যস্থতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে উন্নতি নিশ্চিত করবে', (৩) 'সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাটা একাধারে প্রাকৃতিক এবং প্রয়োজনীয়', (৪) 'পণ্য প্রথা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে, এটা তার স্বভাবজাত'। অ্যাডাম স্মিথের এসব কথা ঠিক হলে দার্শনিক টমাস

* অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)। সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com

বেকন (১৫১২-১৬৬৭) অর্জনপ্রবণ-মুনাফাকেন্দ্রিক-ক্রয়-বিক্রয়প্রধান অর্থনীতি দেখে যে বললেন 'যেসব ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার অনুসন্ধানে লিপ্ত তারা হলেন লোভী, মেষপালক আর রাখাল স্বভাবের ভদ্রলোক'—এ কথার কী হবে? কী হবে দার্শনিক ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬), যিনি বললেন যে 'সম্পত্তির অধিকার (ব্যক্তিগত মালিকানা) কোনো প্রাকৃতিক অধিকার নয়?' কী হবে কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) উত্তরণশীল আর্থসামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বের, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের, শোষণ-বিচ্ছিন্নতা-অর্থনৈতিক স্বার্থসহ শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বের, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার প্রাকৃতিক অবসানের তত্ত্বের, পুঁজিবাদে পণ্য উৎপাদনের সর্বজনীনতার তত্ত্বের, পণ্যের বিনিময়মূল্য নিরূপণে বিমূর্ত শ্রমের তত্ত্বের, সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন তত্ত্বের? এসব বিশ্লেষণে না গিয়ে সরাসরি বলা সঙ্গত যে 'স্বার্থপরতা', 'নিজস্বার্থ' 'স্বস্বার্থ' চরিতার্থ করার প্রবণতা, অর্থপূজা হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের স্বভাবজাত নয় এবং নয় তা প্রাকৃতিক। উল্টো 'স্বার্থপরতা' হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো যৌথভাবনা, যৌথচিন্তা, যৌথ শ্রম, যৌথ উৎপাদন, যৌথসমাজ। সুতরাং দুর্নীতি হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের সহজাতও নয় এবং নয় তা প্রাকৃতিক।

৪. দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতির উৎস কথা

'দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতি' (Political economy of corruption) নিয়ে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান গভীর ভাবনা নেই বললেই চলে। দরিদ্র কৃষক সলিমুদ্দি-সখিনা-যদু-মধু তারা সবাই তাদের শ্রম-উৎপাদিত কৃষিপণ্য তুলনামূলক সস্তায় মধ্যস্বত্তভোগীদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হন—অর্থাৎ কৃষক দুর্নীতি করতে পারেন না, তার পণ্য নিয়ে দুর্নীতি করে মধ্যস্বত্তভোগীরা। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য গার্মেন্টস-টেক্সটাইলসহ সবধরনের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে, যদি তারা শোষণভিত্তিক উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির কোনো কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হন।

রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের (নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা ও বিচার বিভাগ) হেন প্রত্যঙ্গ নেই, যেখানে দুর্নীতি নেই। এতক্ষণ যা বললাম এসবের অর্থ এই-ই নয় যে দুর্নীতি সার্বজনীন (universal)। একটি দেশের কত শতাংশ মানুষ সরাসরি দুর্নীতি করেন এ ধরনের কোনো পরিসংখ্যান পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীতে সময়কালনির্বিশেষে একটি দেশও পাওয়া যাবে না যেখানে মোট অশিশু-জনসংখ্যার (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যায় শিশুদের বাদ দিয়ে, কারণ দুর্নীতিবিচারে তারা প্রযোজ্য নয়) ৫ শতাংশের বেশি দুর্নীতি করেন। তাহলে দুর্নীতি সার্বজনীন (corruption is universal)—এ কথা কোনো দিনই সত্যি ছিল না এবং কোনো দিনই সত্যি হবে না।

দুর্নীতি যে মানুষের স্বভাবজাত বিষয় নয়, নয় তা প্রাকৃতিক—এসবই নিরঙ্কুশ সত্য (absolute truth); অর্থাৎ দুর্নীতির উৎস খুঁজতে হবে মানুষ যে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোতে বাস করে সেখানে, অন্যত্র নয়।

দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মর্মার্থ নিয়ে গুরুত্ববহ তেমন কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে। দুর্নীতির সাধারণ সংজ্ঞা সবাই জানেন অথবা দুর্নীতি কী সবাই বোঝেন—এটা ধরে নিয়েই কালোটাকা ও অর্থ পাচার বিষয়ে যাবার আগে দুর্নীতি নিয়ে দু-একটি বিষয় উত্থাপন জরুরি।

আমি এ দেশে দু ধরনের দুর্নীতি দেখি: *পেটি দুর্নীতি* (যা ছোট দুর্নীতি) আর *মহাদুর্নীতি* (বড় দুর্নীতি)। পেটি দুর্নীতি হলো: বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টিকারী সমাজে পেটের দায়ে কোনোমতে সংসার পরিচালনের

জন্য ব্যয় সংকুলানে "বাজারের অদৃশ্য হাতের কারসাজি" আয়ের এক পদ্ধতি (যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর ফলে ওই ব্যক্তিটিও মানসিক স্বস্তিতে নেই)। এসব আদৌ রেন্টসিকিং নয়। মহাদুর্নীতির তুলনায় পেটি দুর্নীতির পরিণাম সমাজ-অর্থনীতি-সাংস্কৃতিক জীবনে সম্ভবত তেমন কোনো গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে না। আসলে এসব পেটি দুর্নীতিকে উদ্বুদ্ধ করে বড় দুর্নীতিবাজরাই, যারাই আসল 'রেন্ট-সিকার'। এই সিস্টেমও তারাই সৃষ্টি করেছেন—দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি পুনঃসৃষ্টির উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে। আসলে বড় মাপের জাতীয় বিধ্বংসী দুর্নীতিবাজরা উপরতলার পরজীবী-বিত্তবান 'রেন্ট-সিকার'—এ নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ অন্যের বিত্ত-সম্পদ দখল, বেদখল, জবরদখল, হরণ, গ্রহণ, অধিগ্রহণসহ আত্মসাৎই তাদের মূল পেশা ও নেশা—লোভের লাভ এখানে বড় কথা। এসব 'রেন্ট-সিকার' কখনো উচ্চকণ্ঠে বলবেন না 'দুর্নীতি দূর হোক' আর সেটা 'রেন্ট-সিকার' হবার কারণেই। কারণ সেক্ষেত্রে তাদের অনুপার্জিত-হরণকৃত বিত্তের সিস্টেমটাই ভেঙে পড়বে, আর সেই সাথে বিত্তের বৃহৎ অংশ কর-রাজস্বের প্রগ্রেসিভ নীতির মাধ্যমে হাতছাড়া হয়ে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা হ্রাস করবে। সুতরাং 'দুর্নীতি' নিয়ে বড় কথা বলে লাভ নেই। এ কথা বলেও লাভ নেই যে যেহেতু এই দেশে দুর্নীতি এখন একই সাথে অনুভূমিক (horizontal) ও উল্লম্বিক (vertical), সেহেতু অবস্থা খারাপ। দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার ভিত্তি-কারণ কাঠামোটা ভেঙেই দেখুন না দুর্নীতি কোথায় যায়!

৫. কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতি: উৎস ও পরিমাপ-পরিমাণ

অর্থনীতিবিদরা কালো অর্থনীতি বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের সমার্থক প্রত্যয় (category) ব্যবহার করে থাকেন। যেমন ভূগর্ভস্থ (subteranean or underground) অর্থনীতি, চোরাগুপ্তা-লুক্কায়িত (hidden) অর্থনীতি, ছায়াচ্ছন্ন (shadow) অর্থনীতি, জলতলস্থিত (submerged) অর্থনীতি, সমান্তরাল (parallel) অর্থনীতি, অনিয়মিত (irregular) অর্থনীতি, অনানুষ্ঠানিক (informal) অর্থনীতি, গোধূলি (grey) অর্থনীতি, দ্বিতীয় স্তরের (second line) অর্থনীতি ইত্যাদি। একই 'কালো অর্থনীতি' বোঝাতে যত ধরনের প্রত্যয়ই ব্যবহৃত হোক না কেন কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হলো সেসব লেনদেন (transactions), যা দেশের প্রচলিত নিয়মকানুন অনুযায়ী বিধিসাপেক্ষে নয়; অর্থাৎ যা অর্থনীতির সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে সরকার যেসব নিয়মকানুন প্রচলন করেছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় অথবা তার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকারিভাবে গৃহীত যেসব বিধিকে উপেক্ষা করে সেগুলো হলো প্রধানত শুল্ক ও কর বিধি, লাইসেন্সিং নিয়মকানুন, শ্রম স্টান্ডার্ড ইত্যাদি। কালো অর্থনীতিক কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত কালোটাকা—অবৈধ এবং সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হয়। কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মনুষ্য মূল্যবোধের ধার ধারে না এবং নৈতিকভাবে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়।

কালো অর্থনীতির বিপরীতে আমরা সাধারণত যে অর্থনীতির কথা বলি তা হলো বৈধ, প্রচলিত, আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি। প্রচলিত (conventional) অর্থনীতিতে যেসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও লেনদেনের প্রচলন আছে, তার তুলনায় কালো অর্থনীতির লেনদেনের কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়। **কালো অর্থনীতির লেনদেন অনিয়ন্ত্রিত (unregulated), কালো অর্থনীতির লেনদেন করারোপিত নয় (untaxed) এবং কালো অর্থনীতির লেনদেন পরিমাপ করা হয় না (unmeasured)। কারণ ওইসব লেনদেন নথিভুক্ত নয় (working off the books)।**

আমার মতে, **কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল সূত্রটি এ রকম—অর্থ কালো হতে পারে দুটি শর্ত পূরণ করলে** (এসব দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতির জন্যও সমান প্রযোজ্য)**—প্রয়োজনীয় শর্ত**

(necessary condition) ও পর্যাপ্ত শর্ত (sufficient condition)। প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হওয়ার মানে টাকা কালো হওয়ার সম্ভাবনাটি সৃষ্টি হওয়া মাত্র। বিভিন্ন ঐতিহাসিক অর্থনীতি ব্যবস্থার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি ব্যবস্থা 'পণ্য-অর্থ' সম্পর্কাধীন (money-commodity relations) কি-না তার ওপরই নির্ভর করছে অর্থ কালো হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থনীতি ব্যবস্থা পণ্য-অর্থ সম্পর্কাধীন হলে (যা সামাজিক শ্রমবিভাজনের অনিবার্য পরিণতি) যা-কিছু উৎপাদিত হবে তা পণ্য (commodity) হিসেবেই উৎপাদিত হবে এবং তা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হবে—অর্থ (money) । এক্ষেত্রে অর্থ কালো হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তটি পূরণ হয়ে যাবে, কারণ অর্থ পুঁজি হিসাবে পুঁজির স্বাভাবিক ধর্ম পালনের বাহন হয়ে যাবে মাত্র। পুঁজির এহেন ধর্মের অত্যন্ত প্রাঞ্জল বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কস লিখেছেন *"আমাকে ১০ শতাংশ মুনাফা দিন আমি বিনিয়োগে সম্মত। ২০ শতাংশ মুনাফা দিন আমি সক্রিয়তর। ৫০ শতাংশ মুনাফা দিন আমি নিজের বিপদ ডেকে আনতেও কুণ্ঠিত হব না। ১০০ শতাংশ মুনাফা দিন আমি সবধরনের মনুষ্য মূল্যবোধ বিসর্জনে সম্মত। আর যদি ৩০০ শতাংশ মুনাফা প্রাপ্তির আশা থাকে, তাহলে ফাঁসির রায়ের সম্ভাবনা জেনেও এমন কোনো অপরাধ নেই যা আমি করব না"।*

'পণ্য-অর্থ' সম্পর্কের উপস্থিতি কালোটাকা উদ্ভবের সম্ভাবনাজনিত শর্তটি পূরণ করে মাত্র—সেটা পর্যাপ্ত (অনিবার্য) শর্ত নয়। কালোটাকা উদ্ভবের **পর্যাপ্ত শর্ত** হলো বিশেষ ধরনের উৎপাদনপদ্ধতির প্রাধান্যবিশিষ্ট আর্থসামাজিক ব্যবস্থা। আর তা হলো উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক এমন অর্থনীতি ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন সার্বজনীন রূপ লাভ করে—পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিকাঠামো ও উপরিকাঠামো উভয়েই কালোটাকার (দুর্নীতিরও) উৎপত্তি ও বিকাশে পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং 'পণ্য-অর্থ' সম্পর্ক (কালোটাকার ও দুর্নীতির জন্মের প্রয়োজনীয় শর্ত) যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় সর্বজনীনতা লাভ করে, সেই ব্যবস্থাটিই কালোটাকার ও দুর্নীতির উদ্ভব ও বিকাশের প্রধান গ্যারান্টিদাতা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কালোটাকা বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিপরীতে অবৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুঁজির রূপ পরিগ্রহ করে। রাজনৈতিক অর্থনীতির বিচারে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

কালো অর্থনৈতিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত ক্ষেত্রসমূহ হলো: ড্রাগসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্যের বাজার ড্রাগ ডলার, ডার্টি মানি, মাফিয়া মানি, অস্ত্রের বাজার, অর্থ পাচার, মানব পাচার (আসলে দাস শ্রম পাচার), সকল ধরনের অবৈধ ব্যবসায়িক চুক্তি, ছোট-বড় ব্যবসায়ের কমিশন দালালি, ঘুষ, মজুদদারি, কালোবাজারি, জুয়া-ক্যাসিনো, বিভিন্ন ধরনের মাস্তানি-চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, রাষ্ট্রের কর ও করবহির্ভূত আয় ক্ষেত্রসমূহকে ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রের সাথে জড়িত সবাই অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গমাত্র। যেমন ড্রাগসহ বিভিন্ন মাদক উৎপাদন ক্ষেত্রের মালিক ও তার দালাল-মাদক চোরাচালানকারী ও তার সাথে সম্পর্কিত সবাই এবং মাদক ব্যবসায়ী (যারা মাদক ভোক্তার সাথে বিভিন্ন স্তরে সম্পর্কিত)—এরা সবাই কালোটাকার মালিক। এদের সাথে আবার উপরিকাঠামোর অনেকেই বিভিন্নভাবে জড়িত থাকেন, যেমন রাষ্ট্র পরিচালক (প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, আমলা), আইনপ্রণেতা (পার্লামেন্ট ও সিনেট সদস্য), আইন রক্ষাকারী বাহিনী ও গোপন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তি, দেশরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্তাব্যক্তি, রাজনীতিবিদদের অনেকে, বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি (যাদের ব্যবসায়ী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড প্রধানত পরিচয় বৈধতার কারণেই), দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্যাংকের মালিক, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ঊর্ধ্বতন নীতিনির্ধারক, রাষ্ট্রের কর ও শুল্ক আহরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ, টেলিযোগাযোগ ও পরিবহন খাতের অনেকে। সুতরাং একভাবে বলা যায় যে শাসক শ্রেণি (নিঃসন্দেহে দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ নন) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কালোটাকার এবং দুর্নীতির

জন্মদাতা। আর এটাও একটা বড় কারণ যে কেন 'গণতন্ত্র-মুক্ত' জোনে (democracy free zone) বসবাস তাদের এত পছন্দ, কেন তারা গণতন্ত্র (democracy) চান 'demos' (জনগণ)-কে বাদ দিয়ে?

কালোটাকা—কোটিপতিদের পুঁজির আদিসঞ্চয়নেরও (primitive accumulation of capital) মাধ্যম। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে অবৈধ পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে কোটিপতি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। বাংলাদেশ ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে শত-কোটিপতি হবার পাঁচটি প্রধান পথ (সবই অবৈধ) হলো নিম্নরূপ:

(১) সরকারি তহবিল, স্টোর ও পতিত সম্পত্তি আত্মসাৎ, তহবিল তছরুপ ও জোরপূর্বক দখল, এবং আমলাদের পক্ষ থেকে পরিতোষণ।

(২) চোরাচালান, মাদক ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা, মানবপাচার ব্যবসা, অর্থ পাচার ব্যবসা, মজুদদারি, কালোবাজারি, বিদেশি মুদ্রার অবৈধ ব্যবসা, আমদানিতে ওভার ইনভয়েসিং, রপ্তানিতে আন্ডার ইনভয়েসিং ইত্যাদি ব্যবসার সাথে সম্পর্ক।

(৩) জাতীয়করণকৃত অথবা সরকারি এবং বেসরকারি কমার্শিয়াল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত বিশাল পরিমাণের ঋণ আত্মসাৎ ও তা পরিশোধ না করা।

(৪) রাষ্ট্রের সহায়তায় বিদেশি অর্থায়নে কোটি-কোটি ডলার প্রকল্পের (মেগা প্রকল্পসহ) কমিশন এজেন্সি, বিভিন্ন ক্রয়কাজের দালালি।

(৫) পারমিট লাইসেন্স হস্তান্তর, নিজের পক্ষে আইন প্রয়োগ ও পণ্য-দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়।

উল্লিখিত পাঁচটি প্রধান পথ-পদ্ধতির ঘনীভূত প্রকাশ-প্রত্যয় "রেন্টসিকিং" বা "লুটতরাজ" অর্থাৎ নিজে সম্পদ সৃষ্টি না করে অন্যের সৃষ্ট সম্পদ দখলই আমাদের দেশে শত-হাজার কোটিপতি হওয়ার প্রধান পদ্ধতি। এই অর্থে 'শত-কোটিপতি' ও 'কালোটাকার মালিক'—সমার্থক ধারণামাত্র।

কালোটাকার **উৎপত্তি উৎসকে** পরস্পরসম্পর্কিত **দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়**। প্রথমটি—**"বৈধ খাতে অবৈধ কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত কালোটাকা"**, যা সাধারণ কালো আয় সৃষ্টি করে, আর দ্বিতীয়টি—**"অবৈধ খাত-উদ্ভূত কালোটাকা"** যা চক্রবৃদ্ধি হারে কালো আয়ের জন্ম দেয়।

অর্থনীতির বৈধ (আইনি) খাতের কর্মকাণ্ডে যখন কর-শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হয়, তখনই সৃষ্টি হয় "বৈধ খাতে অবৈধ কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত কালোটাকা"। আমাদের দেশে বৈধ খাতে অবৈধ কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত কালোটাকার জন্মক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

(১) ইনডেন্টিং, আমদানি, রপ্তানি, নির্মাণ শিল্পের কর্মকাণ্ড, ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট প্রকৃত আয়, মনুষ্যশক্তি রপ্তানি, মানব পাচারের ব্যবসা, চোরাচালান, কালোবাজারি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, জুয়ার আসর-ক্যাসিনো, ব্যবসায়ে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মূল্যের কারসাজি, তহবিল তছরুপ, ট্রাভেল এজেন্সি, প্রাইভেট হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডায়াগনোস্টিক সেন্টার, অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্য, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবসা, প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়), মিডিয়া, ফিল্ম প্রডাকশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-উদ্ভূত অত্যুচ্চ রিটার্ন;

(২) আইনজ্ঞ, প্রাইভেট চিকিৎসক, উপদেষ্টা-পরামর্শদাতা, ফিল্মের নায়ক-নায়িকাদের ব্যতিক্রমী অত্যুচ্চ পেশাগত ফি;

(৩) জমির (কৃষি, অকৃষি, জলা, জঙ্গল) ব্যবসা, ফ্ল্যাটের ব্যবসা, শেয়ারবাজারে সুপার ক্যাপিটাল গেইন ইত্যাদি।

আমাদের দেশে (সম্ভবত বহু দেশেই) অর্থনীতির বৈধ খাতে অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে যেভাবে কালোটাকা সৃষ্টি হয় তার বহু রকমভেদ আছে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিতে অবৈধ আন্ডার ইনভয়েসিং আর আমদানিতে অবৈধ ওভার ইনভয়েসিং করে একদিকে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া যায়, অন্যদিকে পুঁজি পাচারও (অবৈধ) করা যায়।

ঘুষ, চোরাচালান, কালোবাজারি, অর্থপাচার—এসব অর্থনীতির বৈধ কোনো খাত নয়। এসব **দুই দিক থেকে অবৈধ:** প্রথমত, খাতটি নিজেই আইনগতভাবে অবৈধ, দ্বিতীয়ত, এই খাতে যা উৎপন্ন হয়, লেনদেন হয় পুরোটাই অবৈধ। অবৈধ খাতে কালোটাকা সৃষ্টি-পুনঃসৃষ্টি হয় যেসব ক্ষেত্রে তার মধ্যে আছে বৈদেশিক মুদ্রার বেআইনি লেনদেন, অর্থপাচার, চোরাচালানি, ভেজাল ও নকল দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, গোপন কারখানা স্থাপন, ওজন ও মাপে কম দেওয়া, পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের তুলনায় নিচু মানের নির্মাণকাজ, সিকিউরিটিজ মার্কেটে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা, রেজিস্ট্রেশন ফি ফাঁকি দেওয়ার জন্য সম্পদের (জমি, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি) দাম কম দেখানো, ঘুষ, চোরাচালান, মানব পাচার, ব্যবসায়ে সিন্ডিকেট গঠন করে মূল্য নিয়ে কারসাজি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, অবৈধ জুয়ার আসর (ক্যাসিনো ইত্যাদি), তহবিল তছরুপ, অবৈধ কমিশন প্রাপ্তি, স্বজনপ্রীতির কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাগ পাওয়া এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা।

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তাদের পক্ষে কোনো নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য রাজনীতিবিদ ও আমলাদের ঘুষ প্রদান করেন। অথবা ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা রাজনীতিবিদ ও তদবিরকারীদের মধ্যস্থতায় নিজেদের বেআইনি-নীতিগর্হিত কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য আমলাদের প্রভাবান্বিত করেন। এ হলো অর্থবিত্ত দিয়ে (ঘুষ দিয়ে) অথবা প্রভাব খাটিয়ে রেন্ট-সিকারদের দ্বারা 'নিয়ন্ত্রকসংস্থা কবজাকরণ' (regulatory capture)। রেন্টসিকার-লুটেরাদের প্রাধান্যের আমলে উল্লিখিত যোগসূত্র সমগ্র কালোটাকার সেক্টরের রক্ষাকবজ হিসেবেই কাজ করে।

কালোটাকার বিমূর্ত উৎসসমূহ যেমন একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত তেমনি সকল উৎসের ওপর কর্তৃত্ব করছে আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিসহ রেন্টসিকিং ব্যবস্থা, যা আবার সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি-পুঁজি ও আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির বিকাশেরই ফল, তারই স্থানীয় এজেন্ট। সাম্রাজ্যবাদী আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি যা চায় তা হলো পৃথিবীর যেখানে যত উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হবে তা পুনর্ব্যবহার উপযোগী করার (recycle) নিঃশর্ত অধিকার। আর এ কাজটি যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদিত পণ্যের ওপর প্রযোজ্য তেমনই কালোটাকার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে মোট কালোটাকার পরিমাণ কত তা কারো জানা নেই।

বাংলাদেশে কালোটাকার বিস্তৃতি পরিমাপের জন্য আমি এমন একটি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি, যেখানে গবেষণা ব্যয় তুলনামূলক কম এবং যার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে মোটামুটিভাবে প্রবণতাসূচক ধারণা পাওয়া যাবে এবং কালোটাকার সম্ভাব্য পরিমাণটাও নিরূপণ করা যাবে (পদ্ধতিগত বিষয়াদি সঠিক হলে)।

বাংলাদেশে কালোটাকার বিস্তৃতি পরিমাপের জন্য আমাদের পদ্ধতিকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সম্মিলন বলা যেতে পারে। এ পদ্ধতির সাহায্যে কালোটাকা উদ্ভবের বৈধ ও অবৈধ খাত এবং খাতভুক্ত সব আইটেমের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। বৈধ কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত প্রতিটি খাতের ক্ষেত্রে আমরা সর্বশেষ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের (একটি অর্থবছরের হিসেব করেছি; কোভিড-১৯-এর কারণে ২০১৯-২০-এর হিসেব করিনি) জন্য যা নির্ণয় করতে চেয়েছি, তা হলো "সরকার রাজস্ব আয় বাবদ যে অর্থ পেয়েছে সেটা সম্ভাব্য যা পাওয়া উচিত ছিল (কালোটাকার প্রচলন না থাকলে) তার কতটুকু/কত শতাংশ"। এই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে যে সরকারের রাজস্ব আয়ের সকল খাতেই কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে, সুতরাং ওইসব খাত থেকে কালোটাকা সৃষ্টি হয়। সরকারের রাজস্ব আয়ের খাতসমূহের সাথে যারা জড়িত, তারা সবাই 'বৈধ খাতে কর্মরত'। কিন্তু কালোটাকা অবৈধ খাত থেকেও সৃষ্টি হয়। যেমন চোরাচালান, কালোবাজারি, ঘুষ, অর্থপাচার, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, খুন-মাস্তানি-রাহাজানি, জোরপূর্বক অন্যের জমি-সম্পত্তি দখল, মানবপাচার, মাদক ব্যবসা, সিন্ডিকেট ও অন্যান্য অনেক। অবৈধ খাত-উদ্ভূত কালোটাকার পরিমাণ নির্ণয়ে আমরা পরোক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি।

'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ' উভয় পদ্ধতির প্রয়োগে আমরা প্রথমেই কয়েকটি 'হার' নির্ধারণ করতে চেয়েছি, যে হারসমূহকে জাতীয়ভিত্তিক তথ্যের সাথে সম্মিলন করে খাতভিত্তিক কালোটাকার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব।

বাংলাদেশে কালোটাকার বিস্তৃতি পরিমাপে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য শেষপর্যন্ত কালোটাকার বিভিন্ন উৎস ভিত্তিক যে সকল হার নিরূপিত হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ (সারণি ১ দেখুন):

(১) সরকার যে আয়কর পেয়ে থাকেন (ব্যক্তিগত পর্যায়ের আয়কর ও কর্পোরেট আয়কর) তা সম্ভাব্য প্রাপ্তির (যা পাওয়া সম্ভব অথবা প্রকৃত করযোগ্য আয়ের হিসেবে যে কর সরকারের পাওয়া উচিত ছিল) ২৫ শতাংশের ঊর্ধ্বে নয় (অর্থাৎ আয়ের এ উৎসে সরকার যা পাওয়ার কথা তার ৭৫ শতাংশ পান না)। সরকারি রাজস্ব আয়ের বিভিন্ন উৎসের ক্ষেত্রে এই প্রাপ্তিসম্ভাব্য প্রাপ্তির ২০ থেকে ৫০ শতাংশ। এ হার ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক, শিল্প ও ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ, মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ, আবগারি শুল্কের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ, সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ, আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ, রপ্তানি শুল্কের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ, স্ট্যাম্প, ভূমি রাজস্ব, যানবাহন কর, টোল, রেজিস্ট্রেশন ফি, মাদক শুল্ক, সেবাবাবদ প্রাপ্তি ও অবাণিজ্যিক বিক্রয়—প্রতিটি ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ।

(২) চোরাচালান-উদ্ভূত কালোটাকার পরিমাণ নির্ণয়ের ভিত্তি হলো জ্ঞানাভিজ্ঞ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত, যা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকার যে পরিমাণ অর্থের চোরাচালান ধরতে-জব্দ করতে সক্ষম হয়েছেন (ধৃত-ঘোষিত চোরাচালান) তা মোট (প্রকৃত) চোরাচালানের মাত্র ২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক জব্দকৃত চোরাচালানের পরিমাণ (বিদেশ থেকে যা এসেছে এবং দেশ থেকে যা গিয়েছে) ১৮৩০ কোটি টাকা; এবং

(৩) ঘুষ-উদ্ভূত কালোটাকার পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ১৫৯ জন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে মুনাফার হার ব্যাংকে দীর্ঘমেয়াদি আমানতের কার্যকর সুদের হারের সমান (৮ শতাংশ) এবং উক্ত মুনাফার ৫০ শতাংশ ঘুষ। এ হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে মোট ঘুষের পরিমাণ হবে জিডিপির ৪ শতাংশের সমপরিমাণ (সারণি ১ দেখুন)।

আমাদের হিসেবে বাংলাদেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা (সারণি ২), যা ওই বছরের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির, ২৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা, সারণি ৩ দেখুন) এক-তৃতীয়াংশের (৩৩.৩৩ শতাংশ) সমপরিমাণ।

সারণি ২: বাংলাদেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস অনুযায়ী কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড (সরকার ব্যবহার করে)	কালোটাকা সৃষ্টির উৎস/খাত	উৎস/খাতে সরকারের প্রকৃত প্রাপ্তি (কোটি টাকা)	উৎস/খাতে কালোটাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট সৃষ্ট কালোটাকার শতাংশ (%)
	ক. বৈধ খাত: সরকারের রাজস্ব (কর-শুল্ক ও অন্যান্য) আহরণের খাত			
	ক ১. কর ও শুল্ক থেকে প্রাপ্তির খাত			
১০০০	আয়, মুনাফা ও মূলধনের ওপর কর	১০০,৭১৯	৩,০২,১৫৭	৩৫.৯
৩০০	মূল্য সংযোজন কর	১১০,৫৫৫	১,১০,৫৫৫	১৩.১
৪০০	আমদানি শুল্ক	৩২,৫৫৩	৪৮,৪৩০	৫.৮
৫০০	রপ্তানি শুল্ক	৩৬	৩৬	০.০০৪
৬০০	আবগারি শুল্ক	২,০৯০	৮,৩৬০	১.০
৭০০	সম্পূরক শুল্ক	৪৮,৭৬৬	৭৩,১৪৯	৮.৭
৯০০	অন্যান্য কর	১,৪৮২	১,৪৮২	০.২
	মোট – জাতীয় রাজস্ব বোর্ডনিয়ন্ত্রিত করসমূহ	**২৯৬,২০১**	**৫,৪৪,১৬৯**	**৬৪.৭**
	মোট – জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত করসমূহ			
১০০০ ১১০০ ১২০০ ১৩০০	(কোড ১০০০ = মাদক শুল্ক, ১১০০ = যানবাহন কর, ১২০০ = ভূমি রাজস্ব, ১৩০০ = স্ট্যাম্প বিক্রয় ও সারচার্জ)	**৯,৭২৭**	**২৪,৪০১**	**২.৯**
	ক ২. কর-শুল্ক ব্যতীত প্রাপ্তি (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত)			
	(কোড ১৫০০ = লভ্যাংশ ও মুনাফা, ১৬০০ = সুদ, ১৮০০ = প্রশাসনিক ফি, ১৯০০ = জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, ২০০০ = সেবা বাবদ প্রাপ্তি, ২১০০ = ভাড়া ও ইজারা, ২২০০ = টোল, ২৩০০ = অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়, ২৬০০ = কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি)	**৩৩,১১৬**	**১৭,৬৭০**	**২.১**
	(বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি ও মূলধন রাজস্ব বাদ দেওয়া হয়েছে)			
	সর্বমোট রাজস্ব	**৩৩৯,০৪৪**	**৫,৮৬,২৪০**	**৬৯.৭**
	খ. অবৈধ খাত			
	ঘুষ	-	**১,০০,৯৭৯**	**১২.০**
	চোরাচালান	-	**৯১,৫০০**	**১০.৯**
	অন্যান্য	-	**৬২,৭০০**	**৭.৫**
	মোট অবৈধ খাতে (কালোটাকা)	-	**২,৫৫,১৭৯**	**৩০.৩**
	সর্বমোট কালোটাকা	-	**৮,৪১,৪১৯**	**১০০**

নোট: পূর্ণসংখ্যায় আনার কারণে শতাংশের যোগফল একটু হেরফের হতে পারে (উৎস: *বারকাত, আবুল, ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, পৃ. ৪৯০-৪৯১)।

আমার হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সৃষ্ট মোট ৮,৪১,৪১৯ কোটি টাকা কালোটাকার মধ্যে ৬৯.৭ শতাংশ এসেছে অর্থনীতির বৈধ খাতের অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে আর বাদবাকি ৩০.৩ শতাংশ এসেছে সেসব খাত-ক্ষেত্র থেকে যেগুলো আইনগতভাবেই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (যেমন ঘুষ, চোরাচালান, অন্যান্য)। সবচেয়ে বেশি কালোটাকা সৃষ্টি হয়েছে 'আয়কর, মুনাফার ওপর কর এবং মূলধন কর' ফাঁকি থেকে (মোট কালোটাকার ৩৫.৯ শতাংশ), এরপরে ক্রমানুসারে আছে মূল্য সংযোজন কর (বা ভ্যাট ফাঁকি থেকে, মোট কালোটাকার ১৩.১ শতাংশ), ঘুষ (মোট কালোটাকার ১২ শতাংশ), চোরাচালান (মোট কালোটাকার ১০.৯ শতাংশ), সম্পূরক শুল্ক ফাঁকি (মোট কালোটাকার ৮.৭ শতাংশ), অন্যান্য অবৈধ খাত (মোট কালোটাকার ৭.৫ শতাংশ), আমদানি শুল্ক ফাঁকি (মোট কালোটাকার ৫.৮ শতাংশ)।

কালোটাকার উৎসভিত্তিক ব্যবচ্ছেদের পরে পুরোটা জোড়া লাগানো গেলে নিশ্চিতভাবেই দেখা যাবে যে আমাদের হিসেবের কালোটাকার পরিমাণগতভাবে দ্বিতীয় বড় উৎস **'ঘুষ'** আসলে দ্বিতীয় উৎস নয়—তা নিঃসন্দেহে প্রথম ও একক বৃহৎ উৎস। আর দ্বিতীয় উৎস সে যে-ই হোক না কেন—'ঘুষের' বহু পেছনে থাকবে। কারণ, পরিমাণের দিক থেকে কালোটাকার সবচেয়ে বড় উৎস আয়, মুনাফার ওপর কর এবং মূলধনের ওপর কর ফাঁকি দিতে অনেক ঘুষ দিতে হয়—ঘুষ দিতে হয় ঘাটে ঘাটে এবং ঘুষের 'রেট' মোটামুটি ফিক্স করা আছে। একই কথা আবগারি শুল্ক, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, রাজস্ব বোর্ডবহির্ভূত কর উৎস (মাদক, যানবাহন, ভূমি রাজস্ব, স্ট্যাম্প বিক্রয়), কর-শুল্ক ব্যতীত প্রাপ্তি খাত, চোরাচালানের (সীমান্ত এবং অন্য অনেক জায়গায়) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসব খাতে কর-শুল্ক ফাঁকি দিতে আর চোরাচালানে কী পরিমাণ ঘুষ দিতে হয় তার স্ট্যান্ডার্ড রেট আমাদের জানা নেই। তবে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট খাত-ক্ষেত্র বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রদেয় তথ্যের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া যায় যে **১০০** টাকার সমপরিমাণ কর বা শুল্ক ফাঁকি দিতে এবং চোরাচালান করতে ২০ টাকা ঘুষ দিতে হয় (কারো কারো ধারণায় এটা সর্বনিম্ন রেট), সেক্ষেত্রে আমাদের সারণিতে প্রদেয় ঘুষের হিসাবের (১ লক্ষ ৯৭৯ কোটি টাকা) সাথে আরো কমপক্ষে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ১৩৩ কোটি টাকা (৫,৬৫,৬৬৭ কোটি টাকার ২০ শতাংশ) যোগ করতে হবে, আর যোগফল হবে ২,১৪,১১২ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ঘুষের প্রকৃত পরিমাণ দাঁড়াবে এই ২ লক্ষ ১৪ হাজার ১১২ কোটি টাকা, যা দেশে ওই বছরে সৃষ্ট মোট কালোটাকার ২৫.৫ শতাংশ (১২ শতাংশ নয়)। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো শুধু 'অর্থ পূজা' নয় 'ঘুষ পূজা'। আর ঘুষ পূজার কারণে ঘুষখোর পূজা। এসব তো এখন খালি চোখে দেখতে কোনো বড় বিদ্যা লাগে না—চারপাশে তাকালেই দেখা যায়, উঁচু ফ্ল্যাটের দিকে তাকালে দেখা যায়, শহরে প্রাইভেট গাড়ির নমুনা দেখলে দেখা যায়, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে দেখা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, স্বর্ণের বাজারে দেখা যায়, ডলারের বাজারে দেখা যায়, কানাডার বেগমপাড়াসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড-সিঙ্গাপুর-যুক্তরাজ্য-ভারতের বিভিন্ন পাড়াতেও দেখা যায়, হাইওয়ের পাশে জমি-জলাতে "ক্রয়সূত্রে 'আবদুল' সাহেবের মালিকানা"র বিরাট সাইনবোর্ডে দেখা যায়, গণমাধ্যমের মালিকানা থেকে দেখা যায়, মাছবাজারে দেখা যায়, প্রথম শ্রেণিতে উড়োজাহাজে বিদেশ ভ্রমণের বাহার-বাহাদুরি থেকে দেখা যায়, এয়ারপোর্টে ভিআইপি লাউঞ্জের মানুষগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, ট্রেন-লঞ্চ-স্টিমারের প্রথম শ্রেণিতে দেখা যায়, বিদেশে চিকিৎসা দেখলে দেখা যায়, বিদেশে নিজখরচে লেখাপড়া দেখলে দেখা যায়, বিয়ের বাজারে দেখা যায়, চাকরির বাজারে আমাদের সন্তানদের আবেদনপত্রের সংখ্যা ও উদ্দেশ্য থেকে দেখা যায়, আত্মীয়স্বজন-পরিচিতজনদের মধ্যে চাকরিবাকরির তদবিরের প্যাটার্ন থেকে দেখা যায়, এমনকি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বিশেষ অতিথি-প্রধান অতিথি-

সম্মানীত অতিথির তালিকা থেকেও দেখা যায়। আর এসব থেকে কালোটাকা নিয়ে আমাদের তত্ত্ব, তথ্য, বাস্তব জীবন—সবই তো মেলে। তাহলে তো কালোটাকা নিয়ে আমাদের হিসেবপত্তর এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতি—প্রবণতা হিসেবে নির্ভুল।

কালোটাকার রাজনৈতিক-অর্থনীতি অভিজ্ঞান নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক দৃঢ় উপসংহারে পৌঁছানোর আগে আরো একটা হিসেবের বিষয় বলা খুবই জরুরি। হিসেবটি হলো একটি দেশে ৪০-৫০ বছর ধরে কী পরিমাণ কালোটাকা তৈরি হয়েছে তার হিসাবপত্তর। অর্থাৎ নিরন্তর গতিতে কালোটাকা (black money in dynamics)। **নিরন্তর গতিতে কালোটাকার হিসেবপত্তর আগে কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিগত ৪৭ বছরের জন্য (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত) প্রত্যেক বছরে সৃষ্ট কালোটাকার হিসেবপত্তর করেছি। আমাদের হিসেব অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৬ বছরে বাংলাদেশে সৃষ্ট মোট কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা, যা ওই সময়কালের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির; ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত, যার মোট পরিমাণ ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ১০ হাজার ৯২১ কোটি টাকা) ৩৩.৩ শতাংশের সমপরিমাণ (সারণি ৩ দেখুন)।**

সারণি ৩: বাংলাদেশে কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ: অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯

অর্থবছর	জিডিপি (কোটি টাকায়)		কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ (কোটি টাকায়)**			
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে	২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে*	জিডিপির ২০% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ২৫% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ৩০% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ৩৩.৩% এর সমপরিমাণ হলে
১৯৭২-৭৩	৪,৯৮৫	৫৪,৪০৫	১০,৮৮১	১৩,৬০১	১৬,৩২১	১৮,১১৭
১৯৭৩-৭৪	৭,৫৭৫	৮০,১৬৯	১৬,০৩৪	২০,০৪২	২৪,০৫১	২৬,৬৯৬
১৯৭৪-৭৫	১২,৫৭৪	৭৭,২৯৩	১৫,৪৫৯	১৯,৩২৩	২৩,১৮৮	২৫,৭৩৯
১৯৭৫-৭৬	১০,৭৪৬	৬০,৩৫৯	১২,০৭২	১৫,০৯০	১৮,১০৮	২০,১০০
১৯৭৬-৭৭	১০,৫৩৬	৫৭,০০৯	১১,৪০২	১৪,২৫২	১৭,১০৩	১৮,৯৮৪
১৯৭৭-৭৮	১৩,০২৯	৭২,৬৯৮	১৪,৫৪০	১৮,১৭৪	২১,৮০৯	২৪,২০৮
১৯৭৮-৭৯	১৪,৪৭৭	৭৭,৮৩৩	১৫,৫৬৭	১৯,৪৫৮	২৩,৩৫০	২৫,৯১৯
১৯৭৯-৮০	১৭,২৪৫	৯৭,৯৭৮	১৯,৫৯৬	২৪,৪৯৫	২৯,৩৯৩	৩২,৬২৭
১৯৮০-৮১	১৯,৫৯৬	৯২,৪৫৮	১৮,৪৯২	২৩,১১৪	২৭,৭৩৭	৩০,৭৮৮
১৯৮১-৮২	২৬,৫১৪	১০০,৪৯৬	২০,০৯৯	২৫,১২৪	৩০,১৪৯	৩৩,৪৬৫
১৯৮২-৮৩	২৮,৮৪২	৯৯,০০৪	১৯,৮০১	২৪,৭৫১	২৯,৭০১	৩২,৯৬৮
১৯৮৩-৮৪	৩৪,৯৯২	১১৬,৮২১	২৩,৩৬৪	২৯,২০৫	৩৫,০৪৬	৩৮,৯০২
১৯৮৪-৮৫	৪১,৬৯৬	১২৫,২৬৭	২৫,০৫৩	৩১,৩১৭	৩৭,৫৮০	৪১,৭১৪
১৯৮৫-৮৬	৪৬,৬২৩	১২৯,৪২৫	২৫,৮৮৫	৩২,৩৫৬	৩৮,৮২৮	৪৩,০৯৯
১৯৮৬-৮৭	৫৩,৯২০	১৪৬,৩০০	২৯,২৬০	৩৬,৫৭৫	৪৩,৮৯০	৪৮,৭১৮
১৯৮৭-৮৮	৫৯,৭১৪	১৫৯,৪৪৫	৩১,৮৮৯	৩৯,৮৬১	৪৭,৮৩৩	৫৩,০৯৫
১৯৮৮-৮৯	৬৫,৯৬০	১৭১,৪৩৮	৩৪,২৮৮	৪২,৮৬০	৫১,৪৩২	৫৭,০৮৯
১৯৮৯-৯০	১০০,৩২৯	২৭৩,২৭৯	৫৪,৬৫৬	৬৮,৩২০	৮১,৯৮৪	৯১,০০২

সারণি ৩ চলমান ...

অর্থবছর	জিডিপি (কোটি টাকায়)		কালোটাকার আনুমানিক পরিমাণ (কোটি টাকায়)**			
	নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে	২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করে*	জিডিপির ২০% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ২৫% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ৩০% এর সমপরিমাণ হলে	জিডিপির ৩৩.৩% এর সমপরিমাণ হলে
১৯৯০-৯১	১১০,৫১৮	২৫৯,৮৪৪	৫১,৯৬৯	৬৪,৯৬১	৭৭,৯৫৩	৮৬,৫২৮
১৯৯১-৯২	১১৯,৫৪২	২৫৭,৮৯৮	৫১,৫৮০	৬৪,৪৭৪	৭৭,৩৬৯	৮৫,৮৮০
১৯৯২-৯৩	১২৫,৩৭০	২৬৫,০২৭	৫৩,০০৫	৬৬,২৫৭	৭৯,৫০৮	৮৮,২৫৪
১৯৯৩-৯৪	১৩৫,৪১২	২৮৩,৪০৪	৫৬,৬৮১	৭০,৮৫১	৮৫,০২১	৯৪,৩৭৪
১৯৯৪-৯৫	১৫২,৫১৮	৩২০,৪০২	৬৪,০৮০	৮০,১০১	৯৬,১২১	১০৬,৬৯৪
১৯৯৫-৯৬	১৬৬,৩২৪	৩৩৫,৫৬৩	৬৭,১১৩	৮৩,৮৯১	১০০,৬৬৯	১১১,৭৪৩
১৯৯৬-৯৭	১৮০,৭০১	৩৪৮,৬৬৪	৬৯,৭৩৩	৮৭,১৬৬	১০৪,৫৯৯	১১৬,১০৫
১৯৯৭-৯৮	২০০,১৭৭	৩৬৪,৪৮৩	৭২,৮৯৭	৯১,১২১	১০৯,৩৪৫	১২১,৩৭৩
১৯৯৮-৯৯	২১৯,৬৯৭	৩৮১,৮২৩	৭৬,৩৬৫	৯৫,৪৫৬	১১৪,৫৪৭	১২৭,১৪৭
১৯৯৯-০০	২৩৭,০৮৬	৩৯১,৭৮৬	৭৮,৩৫৭	৯৭,৯৪৭	১১৭,৫৩৬	১৩০,৪৬৫
২০০০-০১	২৫৩,৫৪৬	৩৭৭,০৮৮	৭৫,৪১৮	৯৪,২৭২	১১৩,১২৬	১২৫,৫৭০
২০০১-০২	২৭৩,২০১	৩৯৯,৯৪৯	৭৯,৯৯০	৯৯,৯৮৭	১১৯,৯৮৫	১৩৩,১৮৩
২০০২-০৩	৩০০,৫৮০	৪৪০,০৩০	৮৮,০০৬	১১০,০০৮	১৩২,০০৯	১৪৬,৫৩০
২০০৩-০৪	৩৩২,৯৭৩	৪৭৫,০১৬	৯৫,০০৩	১১৮,৭৫৪	১৪২,৫০৫	১৫৮,১৮০
২০০৪-০৫	৩৭০,৭০৭	৫০৬,৯৩১	১০১,৩৮৬	১২৬,৭৩৩	১৫২,০৭৯	১৬৮,৮০৮
২০০৫-০৬	৪৮২,৩৩৭	৬০৩,৪৯৬	১২০,৬৯৯	১৫০,৮৭৪	১৮১,০৪৯	২০০,৯৬৪
২০০৬-০৭	৫৪৯,৮০০	৬৬৮,৯৭৯	১৩৩,৭৯৬	১৬৭,২৪৫	২০০,৬৯৪	২২২,৭৭০
২০০৭-০৮	৬২৮,৬৮২	৭৬৯,৯৭৪	১৫৩,৯৯৫	১৯২,৪৯৪	২৩০,৯৯২	২৫৬,৪০১
২০০৮-০৯	৭০৫,০৭২	৮৬১,১১৪	১৭২,২২৩	২১৫,২৭৮	২৫৮,৩৩৪	২৮৬,৭৫১
২০০৯-১০	৭৯৭,৫৩৯	৯৬৮,৬৭৮	১৯৩,৭৩৬	২৪২,১৬৯	২৯০,৬০৩	৩২২,৫৭০
২০১০-১১	৯১৫,৮২৯	১,০৮০,৬০৯	২১৬,১২২	২৭০,১৫২	৩২৪,১৮৩	৩৫৯,৮৪৩
২০১১-১২	১,০৫৫,২০৪	১,১১৯,৪১১	২২৩,৮৮২	২৭৯,৮৫৩	৩৩৫,৮২৩	৩৭২,৭৬৪
২০১২-১৩	১,১৯৮,৯২৩	১,২৬০,৩২৯	২৫২,০৬৬	৩১৫,০৮২	৩৭৮,০৯৯	৪১৯,৬৮৯
২০১৩-১৪	১,৩৪৩,৬৭৪	১,৪৫২,৭৬৫	২৯০,৫৫৩	৩৬৩,১৯১	৪৩৫,৮৩০	৪৮৩,৭৭১
২০১৪-১৫	১,৫১৫,৮০২	১,৬৩৯,৮১৮	৩২৭,৯৬৪	৪০৯,৯৫৪	৪৯১,৯৪৫	৫৪৬,০৫৯
২০১৫-১৬	১,৭৩২,৮৬৪	১,৮৬০,৪২১	৩৭২,০৮৪	৪৬৫,১০৫	৫৫৮,১২৬	৬১৯,৫২০
২০১৬-১৭	১,৯৭৫,৮১৭	২,০৯৮,০৮৭	৪১৯,৬১৭	৫২৪,৫২২	৬২৯,৪২৬	৬৯৮,৬৬৩
২০১৭-১৮	২,২৫০,৪৮১	২,৩০৩,১৬৯	৪৬০,৬৩৪	৫৭৫,৭৯২	৬৯০,৯৫১	৭৬৬,৯৫৫
২০১৮-১৯	২,৫২৪,৪৮৪	২,৫২৪,৪৮৪	৫০৪,৮৯৭	৬৩১,১২১	৭৫৭,৩৪৫	৮৪০,৬৫৩
মোট	**২১,৪২৪,২১৪**	**২৬,৬১০,৯২১**	**৫,৩২২,১৮৪**	**৬,৬৫২,৭৩০**	**৭,৯৮৩,২৭৬**	**৮,৮৬১,৪৩৭**

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক বিনির্মিত (দেখুন, বারকাত, আবুল, ২০২০, *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*, পৃ. ৪৯৪-৪৯৬)।। নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য যেসব উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ: (১) Bangladesh Bank (2020b). Time series data since 1972 (downloaded from: https://www.bb.org.bd/econdata/index.php, accessed on 03 August 2020) থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে

জিডিপির তথ্য; (২) Bangladesh Bureau of Statistics (1991). Statistical Yearbook of Bangladesh 1990 p. 506 থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (৩) Bangladesh Bureau of Statistics (1988). Statistical Yearbook of Bangladesh 1987 (p. 498) থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৮৪-৮৫ পর্যন্ত অর্থবছরে বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (৪) Bangladesh Bureau of Statistics. (1982). Statistical Pocket Book of Bangladesh 1980 (p. 389) থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮০-৮১ সময়কালের নির্দিষ্ট অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য (১৯৮০-৮১-এর তথ্য 'প্রভিশনাল' বা সাময়িক হিসেব); (৫) Bangladesh Bureau of Statistics. (1980). Statistical Pocket Book of Bangladesh 1979 (p. 377) থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ এবং ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরের বাজারমূল্যে জিডিপির তথ্য; (৬) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০), বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (পৃ. ৫০) থেকে নেওয়া হয়েছে ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সময়কালের তথ্য।

* ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার: ১ মার্কিন ডলার = ৮৪.০৩ টাকা। অন্যান্য অর্থবছরের জন্য হিসেবটি এ রকম: ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল: ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭ টাকা। সে হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়কালের জিডিপি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রয়োগ করলে দাঁড়ায়: ৪,৯৮৫ কোটি টাকা × (৮৪.০৩ ÷ ৭.৭) অর্থাৎ ৫৪,৪০৫ কোটি টাকা। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য অর্থবছরের প্রকৃত তুলনীয় জিডিপি নিরূপণ করা হয়েছে।

** প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত। হিসেবের বিস্তারিত পদ্ধতি এ অধ্যায়েই দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এখন থেকে তিন দশক আগে এই গ্রন্থের লেখক বাংলাদেশে কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতি ও পরিমাপের প্রয়াস নিয়েছিলেন, যা ছিল এ দেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথমদিকের প্রয়াস। প্রথমদিকের পদ্ধতিতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দেখুন: বারকাত, আবুল (১৯৯১), কালো অর্থনীতি ও কালো অর্থ—উদ্ভবের শর্ত, বিস্তৃতি পরিমাপের অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশে তার পরিমাপ। [*রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল*, জুন-ডিসেম্বর, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩০-৫৩; [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র]; Barkat, A. (1992). The context of black money and its measurement। এর কিছু আগে বাংলাদেশে কালোটাকার পরিমাণ পরিমাপের প্রয়াস নিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রয়াত শিক্ষক অধ্যাপক ড. সাদরেল রেজা, তবে তিনি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কোনো ব্যবস্থা বিশ্লেষণের দিকে যাননি (দেখুন, Reza, S. (1989). The Black Economy in Bangladesh: Preliminary Observations)।

বাংলাদেশে সমগ্রক দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতির কাঠামোতে কালোটাকার উদ্ভব ও বিকাশের যে বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট বলা যায়: বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কালোটাকার মালিকশ্রেণি—রেন্টসিকার-লুটেরা-পরজীবী-অনুৎপাদনশীল-নিকৃষ্ট পুঁজির মালিকেরা যে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পুষ্ট হচ্ছেন—এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। কালোটাকার বিগত ৪৬ বছরের (১৯৭২/৭৩-২০১৮/১৯) ইতিহাস থেকে এটাও প্রক্ষেপণ সম্ভব যে সবকিছু যেমন চলছে, তেমনই চলতে থাকলে কালোটাকার মালিকেরা যে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে সক্ষম ও ইচ্ছুক—এমন ভাবনা অলীক বৈ কিছু নয়। সবকিছু বিচারে কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মবস্তুসহ কালোটাকার মালিকদের এহেন প্রভাব-প্রতাপ ইতিমধ্যে যেসব মারাত্মক 'স্বাভাবিক অঘটন' ঘটিয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) তারা সমগ্র সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকাঠামোকেই এমন বিকৃত করে ছেড়েছে, যা বজায় রেখে শোষণমুক্ত-বৈষম্যহীন-অসাম্প্রদায়িক সমাজ—শোভন সমাজব্যবস্থা গড়া অসম্ভব;

(২) কালোটাকার ঋণাত্মক প্রভাব পড়েছে সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি সর্বত্র, যে কারণে এখন অর্থপূজা সর্বজনীনতা পেয়েছে, এখন 'অর্থপূজার' ওপরে আর কোনো পূজা নেই;

(৩) অতীতে দেশে রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল, সেটি আর নেই। অতীতে সরকার

ও ক্ষমতার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল সেটি বিনষ্ট হয়েছে। অতীতে সরকার-এর (government) হাতে ক্ষমতা (power) ছিল—এখন নেই; এখন সরকার সরকারের জায়গায় আছেন, তবে ক্ষমতাহীন; ক্ষমতা রাজনীতি থেকে অভিবাসিত হয়েছে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক কালোটাকার মালিক-রেন্ট সিকার-লুটেরা-পরজীবী-অনুৎপাদনশীল নিকৃষ্ট পুঁজির হাতে (power has migrated from politics to rent seeking economics);

(৪) কালোটাকার মালিক গোষ্ঠী/শ্রেণি 'গণতন্ত্রমুক্ত জোনের বাসিন্দা' (resides in the 'democracy free' zone) এবং গণতন্ত্রকে তারা ভোটের খেলা বানিয়ে ছেড়েছেন-ছাড়বেন, যেখানে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা বা প্রয়োজন কোনোটাই থাকবে না;

(৫) যেভাবে চলছে, সেভাবে চলতে থাকলে—বাংলাদেশে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হতে পারে ফ্যাসিস্ট সরকার, ইসলাম ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। আর অবস্থা পরিবর্তিত হলে হবে সামাজিক-অর্থনৈতিক মৌলিক পরিবর্তন, যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক-আলোকিত মানুষের—শোভন সমাজ বিনির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(৬) কালোটাকার বিস্তৃতি সমাজ অর্থনীতিতে বৈষম্য বাড়িয়েছে-বাড়াচ্ছে-বাড়াবে, ফলে উত্তরোত্তর অধিক হারে মানুষ বহুমুখী বিচ্ছিন্নতার শিকার হতে বাধ্য;

৬. অর্থ পাচারের রাজনৈতিক অর্থনীতি

অর্থ পাচার (Money Laundering)—'দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতির'ই অন্তঃস্থ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার মানে অর্থ পাচার হলো দুর্নীতি-নীতিহীন বিষয়। অর্থ পাচার একই সাথে কালোটাকা (black money) আবার কালোটাকা নয়। যে কালোটাকা পাচার হয়, তা নিঃসন্দেহে 'দুর্নীতিগ্রস্ত-অর্থপাচার"। যেমন যে অর্থের ওপর কোনো কর দেওয়া হয়নি (untaxed) অথবা যে অর্থের লেনদেন নথিভুক্ত নয় (working off the books) সে অর্থপাচার নিঃসন্দেহে 'দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থপাচার'। কিন্তু যে অর্থের ওপর কর দেওয়া হয়েছে (taxed) এবং যে অর্থ নথিভুক্ত-খাতাপত্রে আছে—সে অর্থ দেশের বাইরে চলে গেলে (অথবা উল্টোটা) তা 'দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থপাচার'; কিন্তু কালোটাকার পাচার নয়। যেমন কেউ যদি ইতিমধ্যে কর দেওয়া সঞ্চিত অর্থ নিয়ে চিকিৎসা করাতে কলকাতা-দিল্লি-ভেলর-ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর যান, তা পাচার; কিন্তু কালোটাকার পাচার নয়। মানুষ এসব করতে বাধ্য হন—কারণ একদিকে দেশে ওই চিকিৎসার সুযোগ নেই, আর অন্যদিকে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী কেউই বছরে ৫ হাজার ডলারের বেশি বিদেশে নিয়ে যেতে পারেন না; নিজ অর্থায়নে বিদেশে শিক্ষার ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য।

অর্থ পাচার আবার একমুখী নয় (single direction)। দেশের অর্থ যখন বিদেশে পাচার হয়, যাকে বলে বহির্মুখী অর্থ পাচার (out bound money)– উভয়মুখী তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কালোটাকা (ওপরের চিকিৎসা ও শিক্ষাসম্পর্কিত ও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ বাদে)। কিন্তু যখন তা অন্তর্মুখী অর্থাৎ পাচার হয়ে বিদেশ থেকে স্বদেশে আসে, তখন তা কালোটাকা হতেও পারে না-ও হতে পারে। যেমন পাচারকৃত কালোটাকা বিদেশে ভ্রমণ করে ধুয়ে-মুছে **(money laundering-এর laundering শব্দটি 'লন্ড্রি' থেকে এসেছে; 'লন্ড্রির' কাজ ময়লা কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করা)** যখন স্বদেশে ফেরে, তখন তা 'ধৌতকৃত অর্থ' হলেও তার উৎস কালোটাকা (**এ হলো কয়লার মতো—যত ধুতে থাকুন না কেন ময়লা যাবে না**)। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত একজন বাংলাদেশি শ্রমিক উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যখন হুন্ডি-হাওয়ালা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে দেশে অর্থ পাঠান, সেটা সংজ্ঞাগতভাবে অর্থ পাচার হলেও তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনেকটা 'মহৎ উদ্দেশ্যের

দুর্নীতি'র মতো ('noble cause corruption'—হিটলারের ইহুদি নিধন থেকে রক্ষা করতে কেউ কেউ গেস্টাপোদের ঘুষ দিত) অর্থাৎ তা দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থ পাচার নয়। এসব হলো প্রচলিত অর্থের 'খারাপ'-এর মধ্যে ভালো-মন্দ বিবেচনা। এসবই হলো অর্থ পাচারের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশেষ দিক। এখন আসা যাক 'দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থ পাচার' অর্থাৎ সাধারণ্যে যে অর্থ পাচারকে যৌক্তিক কারণেই নিন্দনীয় বলা হয়, ঘৃণা করা হয়, উন্নয়নে 'ঋণাত্মক' বিষয় হিসেবে মনে করা হয়—সেই অর্থপাচারের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে।

অর্থ পাচারের রাজনৈতিক অর্থনীতি—কালোটাকার রাজনৈতিক অর্থনীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, এবং যা আবার বড় পর্দার "দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতির" অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অর্থপাচার বা 'মানি লন্ডারিং' বলতে সাধারণভাবে অবৈধ মুদ্রা পাচার বোঝায়। **আমার মতে, মানি লন্ডারিং হলো অবৈধ পথ-পদ্ধতি-পন্থা-উপায়ে আহরিত অর্থ-সম্পদের অবৈধ হস্তান্তর বা রূপান্তর।** এর আগে কালোটাকার উদ্ভব-সূত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখিয়েছি যে কালোটাকা বা black money প্রধানত দুভাবে—দুটি বড় খাতে সৃষ্টি হয়—*প্রথমটা* হলো সেসব খাত যা খাত হিসেবে বৈধ, কিন্তু ওই খাতে অবৈধ কর্মকাণ্ড করা সম্ভব; যেমন সরকারের কর-রাজস্ব ও কর-রাজস্ববহির্ভূত সকল আয়ের খাত (যেমন—ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক, আমদানি-রপ্তানি, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি, যা সারণি ২-এ বিস্তারিত দেখানো হয়েছে)। এসব বৈধ খাতে যে পরিমাণ কর-রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়, সেটাই কালোটাকা। এরপর *দ্বিতীয়টা* হলো সেসব খাত, যা জন্মসূত্রেই বেআইনি সুতরাং অবৈধ। যেমন ঘুষ, চোরাচালান, মাদক ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা, মানব পাচার ইত্যাদি। আর উল্লিখিত দুই বড় পদ্ধতিতে যেসব কালোটাকা সৃষ্টি হয় (অবশ্য 'সৃষ্টি' কথাটা সঠিক নয়, কারণ এসব হলো 'অনাসৃষ্টি') তা যদি ধুয়ে-মুছে সাদা করার (বা laundry করা অর্থাৎ ধৌতকরণ) চেষ্টায় পাচার বা অবৈধ পন্থায় স্থানান্তরিত হয় বা অভিবাসিত হয়, সেটাই অর্থ পাচার (migrated black money বলা যায়; এটা migrate out হতে পারে, migrate out হয়ে পড়ে পুরো/একাংশ migrate in হতে পারে)।

সংশ্লিষ্ট গবেষকেরা বলছেন যে এখন পৃথিবীতে বছরে অর্থ পাচার বা মানি লন্ডারিং-এর পরিমাণ আনুমানিক ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (অথবা ২ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার) অর্থাৎ ১৬৬ লক্ষ কোটি টাকা, যা বৈশ্বিক জিডিপির ৫ শতাংশের সমপরিমাণ। **অর্থপাচার বা মানি লন্ডারিং-এ পাচারকৃত অর্থকে তিনটি পর্যায় পেরুতে হয়। প্রথম পর্যায়—জমাকরণ (placement), দ্বিতীয় পর্যায়—স্তর বিন্যাস (layering), তৃতীয় পর্যায়—একীভূতকরণ বা ছেঁকে তোলা (integration)।** অর্থ পাচারকারী প্রথমে তার নগদ অর্থ (প্রধানত বিদেশি মুদ্রায়) পৃথিবীর কোনো না কোনো বড় ব্যাংকে জমা করেন, তারপরে জমাকৃত অর্থ ১০০-১৫০টি ছোট ছোট ব্যাংকে এবং/অথবা মানি চেঞ্জার হাউজে ছড়িয়ে দেন, তারপরে লাটাই গুটিয়ে সব একীভূত করেন। ঘটনাটা ঘটে এভাবে: অর্থপাচারকারী প্রথমে কোনো না কোনো বড় ব্যাংকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য (ধরুন বড়জোর ১-২ ঘণ্টা) অর্থ জমা করেন (placement); এই জমা করার ১-২ ঘণ্টার মধ্যে তিনি তার অর্থ পৃথিবীর ছোটখাটো ১০০-১৫০টি ব্যাংক এবং/অথবা মানি চেঞ্জার হাউজে স্তরে স্তরে ছড়িয়ে দেন—যাকে বলে layering (পৃথিবীতে এ ধরনের ব্যাংক, মানি চেঞ্জার হাউজ অনেক আছে—কিছু আছে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে, কিছু আছে ল্যাতিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশে, কিছু আছে আফ্রিকায়—যাকে বলে 'ট্যাক্স হ্যাভেন'); এরপর তৃতীয় পর্যায়ে ওই সব ছড়িয়ে দেওয়া অর্থ টেনে একত্রিত করা হয়, যাকে বলে (integration)। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায় নেওয়া (অর্থাৎ placement এবং placement থেকে layering)। একবার স্তরে স্তরে ছড়িয়ে দিতে পারলেই 'লন্ড্রি'র কাজ হয়ে যায়—অর্থাৎ নোংরা-দুর্গন্ধযুক্ত-পাচার করা অর্থ ধুয়ে-মুছে সাদা হয়ে যায় (এ হলো দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা পাচারকৃত অর্থকে সুগন্ধীকরণ প্রক্রিয়া)। গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে

বড় মাপের পাচারকৃত অর্থের প্রধান উৎস তিনটি, যার মধ্যে আছে—কর-শুল্ক ফাঁকি (মোট পাচারকৃত অর্থের ৬৫ শতাংশ), বিভিন্ন ধরনের ক্রাইম বা অপরাধ (মোট পাচারকৃত অর্থের ৩০ শতাংশ), তারপরেই আছে 'ঘুষ' (মোট পাচারকৃত অর্থের ৫ শতাংশ)। তবে স্থান-কাল এবং অর্থের পরিমাণভেদে এ অনুপাত একই রকম নয়। যেমন মেক্সিকো থেকে অর্থ পাচারের বড় অংশই 'ক্রাইম-ড্রাগ ক্রাইম'; নাইজেরিয়া থেকে পাচারকৃত অর্থের বড় অংশ 'কর-শুল্ক ফাঁকি'; আর চীন থেকে পাচারকৃত অর্থের বড় অংশ 'ঘুষ'। পাচারকৃত অর্থ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে সাদা করার পরে (কিছু অংশ আগেও হতে পারে) ওই অর্থ প্রধানত তিন-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়: আনুমানিক ৩০ শতাংশ আইনিভাবে বৈধ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়, ২৫ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর করা হয়, ২৫ শতাংশ ঘুষ দেওয়া হয়, ২০ শতাংশ বিলাসী জীবন যাপনের কাজে ব্যবহার করা হয় (যেমন দামি ভিলা-দালানকোঠা কেনা, জমি কেনা, দামি গাড়ি কেনা, হিরা-মণিমুক্তো-সোনাদানা কেনা, ক্যাসিনোতে জুয়া খেলা, প্রথম শ্রেণিতে দেশভ্রমণ করা ইত্যাদি)।

আমাদের দেশে বছরে কী পরিমাণ অর্থ পাচার হয়? এ নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো তথ্যনির্ভর ও নির্ভরযোগ্য গবেষণা নেই। তবে ওয়াশিংটনভিত্তিক গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি রিপোর্ট (২০১৯) অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী বার্ষিক অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে বৈশ্বিক জিডিপির ৫ শতাংশের সমপরিমাণ। তবে দেশভিত্তিক বিস্তরণটা (range variation) অনেক, জিডিপির ১ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত। **অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্ভবত নিদেনপক্ষে সেসব দেশের ক্যাটেগরিতে পড়ে, যাদের অর্থ পাচারের পরিমাণ জিডিপির ২.৫-৩.৫ শতাংশের মধ্যে। আমরা যদি নিচের দিকের গড় ধরি (অর্থাৎ জিডিপির ৩ শতাংশ) সেক্ষেত্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭৫,৭৩৪ কোটি টাকা, যা একই অর্থবছরের সৃষ্ট মোট কালোটাকার (৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা) ৯ শতাংশের সমপরিমাণ এবং একই অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৬.৩ শতাংশের সমপরিমাণ। আমাদের হিসেবে বিগত ৪৬ বছরে (১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে) দেশে মোট অর্থ পাচারের পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা।**

৭. বিদ্যমান আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোতে দুর্নীতি রোধ, কালোটাকা ও অর্থ পাচার উদ্ধার-উদ্দিষ্ট প্রধান সুপারিশ

দুর্নীতির রাজনৈতিক অর্থনীতিটাই এমন যে রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরানিয়ন্ত্রিত আর্থরাজনৈতিক কাঠামোতে দুর্নীতি উচ্ছেদ আর কালোটাকা ও অর্থ পাচার উদ্ধারে খুব বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। তবে এ প্রসঙ্গে দু'টো কাজ করা সম্ভবত সম্ভব। তা হলো:

প্রথমত: "দুর্নীতি, কালোটাকা ও অর্থ পাচার" সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি স্বাধীন কমিশন ("Independent Commission on Corruption, Black Money and Money Laundering") গঠন করা যেতে পারে। এই কমিশনের প্রধান কাজ হবে দুর্নীতি, কালোটাকা ও অর্থ পাচারসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া এবং অনুসন্ধান-গবেষণাফল প্রতি তিন মাস অন্তর দেশের সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা। একই সাথে কমিশনের নিজস্ব ভেরিফায়েড ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা। প্রস্তাবিত এই স্বাধীন কমিশন পরিচালনের প্রধান নীতি-দর্শন (principle philosophy) হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের "সংবিধানের প্রাধান্য"– ৭ (১) ও ৭ (২) অনুচ্ছেদ: *"(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবলমাত্র এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (২) জনগণের*

অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।" প্রস্তাবিত এ কমিশন যেহেতু স্বাধীন, সেহেতু কমিশন তার কাজের জন্য সরাসরি জনগণের কাছেই জবাবদিহি করবে (প্রয়োজনে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রধানের কাছে রিপোর্ট করবে)। মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে প্রস্তাবিত এ কমিশন গঠিত হবে, যার মধ্যে ১ জন প্রধান কমিশনার (নারী অথবা পুরুষ) ও ৮ জন কমিশনার (৪ জন নারী ও ৪ জন পুরুষ)। কমিশন তার কর্ম সম্পাদনে মোট ১০০ জন গবেষক-গবেষণা সহকারী নিযুক্ত করবে। প্রধান কমিশনারসহ সকল কমিশনার নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রের প্রধান; নিযুক্তিকাল হবে ৩-৫ বছর; কমিশনারদের যে কেউ যেকোনো সময় ইস্তফা দিতে পারবেন (ইস্তফার কারণ উল্লেখ অথবা উল্লেখ না করে); এবং নিযুক্তিকালে ছেড়ে চলে যেতে বলার দায়-দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে। কমিশনের সদস্য হতে পারবেন শুধু তারা, যারা স্ব-গুণাবলি, দেশপ্রেম ও জ্ঞানসমৃদ্ধতার কারণে জনসাধারণ্যে পরিচিত এবং সম্মানিত। এই কমিশনে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির কোনো ব্যক্তি (তিনি ওই ক্যাটেগরিতে বর্তমানে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত যেটাই হোক না কেন) কমিশনার (কমিশন সদস্য) হতে পারবেন না: আমলা, সামরিক বাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, (পেশাগত) ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, রাজনৈতিক দলের সদস্য, গণমাধ্যমের মালিক। রাষ্ট্র কমিশনকে এককালীন ১০০ কোটি টাকার ৩ বছরের বাজেট অগ্রিম দেবে (প্রধান কমিশনার রাষ্ট্রের সাথে বাজেটে স্বাক্ষর করবেন), কমিশন প্রতি ৩ মাস অন্তর কমিশনের আয়-ব্যয় জনসম্মুখে উপস্থাপন করবে; গঠনের ৩ মাসের মধ্যে রাষ্ট্র কমিশনের জন্য বহুতল স্থায়ী কমিশন ভবনের ব্যবস্থা করবে; রাষ্ট্র কমিশনে কর্মরত সকলের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। প্রস্তাবিত এ কমিশন স্বাধীন, বিধায় কমিশনের সাথে বর্তমান দুর্নীতি দমন কমিশনের তেমন কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে স্বাধীন এই কমিশন প্রয়োজনে দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে বলতে পারবে। দুর্নীতির কারণে, কালোটাকার মালিক হবার কারণে, অর্থ পাচার করার কারণে প্রস্তাবিত এই কমিশন কাউকে শাস্তি দিতে পারবে না, শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্লেষণপূর্বক রাষ্ট্রপতি এবং/অথবা প্রধান বিচারপতির বরাবর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে।

দ্বিতীয়ত: এখন থেকে প্রস্তুতি নিলে আগামী অর্থবছরে (২০২১-২২) মাত্র ৪০ হাজার কোটি টাকা কালোটাকা এবং ৫৫ হাজার কোটি টাকা পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার সম্ভব। পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে এই ধারা উত্তরোত্তর জোরদার করতে হবে। এ কর্মকাণ্ডে সম্ভাব্য যাদের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে, তাদের মধ্যে রয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-সম্পর্কিত জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কমিটি-কমিশন, (প্যারিসভিত্তিক) ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি রিপোর্ট প্রণেতাদের সংস্থা (তবে নির্মোহ বিচার-বিশ্লেষণের পরে), প্রধান বিচারপতি, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সংসদের সকল স্থায়ী কমিটি, অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রজাতন্ত্রের মহা হিসাব নিরীক্ষক, দেশের আইনশৃঙ্খলা প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-সংশ্লিষ্ট অফিস, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য।